নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৪ পৃঃ ২৫-৪২
© ২০০৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বাস্তুচ্যুতি প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক পরিসর : একটি বিশ্লেষণ

আফরোজা সুলতানা*

১. ভূমিকা

সারা পৃথিবীতে ব্যস্তচ্যুতি সাধারণ প্রপঞ্চে পরিণত হয়েছে । যদিও গবেষক, চিন্তকদের প্রধান মনোযোগ পেয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহ। বিভিন্ন সাহিত্য হতে মানুষজনের বাস্তুচ্যুতিকে মোটা দাগে দুইটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষের তৈরী কারণ সমূহ যেমন উন্নয়ন পরিকল্পনা, সশস্ত্র সংঘর্ষ,যুদ্ধ, সেনা কর্তৃক অধিগ্রহণ প্রভৃতি এবং অন্যটি হচ্ছে প্রকৃতি সৃষ্ট বিভিন্ন কারণ অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন বন্যা, নদীভাঙ্গন, সুনামি, সাইক্লোন, গ্যাস বিস্ফোরন প্রভৃতি। খোদ বাস্তুচ্যুতিও আবার দুইভাগে বিভক্ত, একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীন ব্যস্তচ্যুতি, যেখানে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ নিজ দেশের সীমানা অতিক্রম করে না আর অন্যটি হচ্ছে রিফিউজি, যারা নিজ দেশের সীমানা অতিক্রম করে যায়। এই প্রবন্ধের মনোযোগের জায়গা হচ্ছে অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ। অভ্যন্তরীন ব্যস্তচ্যুত ব্যক্তিবর্গদের সম্পর্কিত বিভিন্ন সাহিত্য পর্যালোচনায় বাস্তুচ্যুতির যে প্রভাব বাস্তুচ্যুত মানুষজনের উপর পড়ে তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া গেলেও যে প্রক্রিয়ায় মানুষজন ব্যস্তচ্যুত হয় বা হতে বাধ্য হয় সেই আলোচনা, চূড়ান্ত বাস্তুচ্যুতি ঘটার পিছনে যে বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক অনুঘটক সমূহের জটিল প্রক্রিয়া কাজ করে সেই প্রক্রিয়ায় মনোযোগ দেওয়া হয়েছে খুব কম সংখ্যক সাহিত্যেই। এই প্রবন্ধ, বিভিন্ন সাহিত্যের সহযোগীতায় এবং একটি কেইস উপস্থাপনের মাধ্যমে, যা আমার স্নাতকোত্তর অভিসন্দর্ভ থেকে নেওয়া, বাস্তুচ্যুতির প্রক্রিয়ার দিকে মনোযোগ দিবে এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ব্যস্তচ্যুতির প্রক্রিয়া কোনভাবেই অরাজনৈতিক নয়, তা সে মনুষ্য সৃষ্ট বা প্রকৃতি সৃষ্ট যে কারণেই ঘটুক না কেন।

২. বাস্তুচ্যুতি : প্রত্যয় আলোচনা

সাধারণ অর্থে বাস্তুচ্যুতি হচ্ছে স্থানচ্যুতি। অর্থাৎ বাস্তুচ্যুতির ফলে মানুষজন নিজের পরিচিত বাসস্থান, পরিবেশ, সম্পদ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় (ব্রান, ২০০৩)। বামির (১৯৯৪) এর মতে বাস্তুচ্যুতি হচ্ছে একই সাথে খন্ডন বা বিযুক্তি এর দ্বৈত অবস্থান। বাস্তুচ্যুতি হচ্ছে 'ইনবিটুইননেস' অবস্থা, এটি হচ্ছে একই সাথে কয়েকটি স্থানের সাথে যুক্ত থাকার অবস্থা এবং একই সাথে একটি স্থানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা (Struggle)। বাস্তুচ্যুতির কারণে মানুষজন তাদের প্রতিদিনকার চর্চা, পরিচিত পরিবেশ, বস্তুগত সম্পদ থেকে বিচ্যুত হয় তাই বাস্তুচ্যুতি হচ্ছে অবিচার। বাস্তুচ্যুতিকে বৈশিষ্ট্যায়িত করা হয় ক্ষয়ক্ষতি, শারীরিক, মানসিক কষ্ট এবং প্রান্তিকীকরণ দ্বারা। কিন্তু বাস্তুচ্যুতি যুক্ত হতে পারে আবিস্কারের

* ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনির্ভাসিটি, বাংলাদেশ, ঢাকা।
ই-মেইলঃ afroza.sultana@iub.edu.bd

সাথেও। কারো কারো মতে, বাস্তুচ্যুতি হচ্ছে পরিবর্তন এবং নতুন সম্ভাবনা তৈরীর প্রক্রিয়া (ব্রান, ২০০৩ : ২৬)। বাস্তুচ্যুতি দীর্ঘস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী হতে পারে। বাস্তুচ্যুতির কারণে মানুষজন কয়েক মাইল থেকে কয়েকশ মাইল পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারে (জাকারিয়া এবং শানমুগারাতনাম, ২০০৩)। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় বাস্তুচ্যুত মানুষজন বলতে সাধারণভাবে আমরা "রিফিউজী" দের বুঝে থাকলেও (বার্কল্যান্ড, ২০০৩) সাধারণভাবে বাস্তুচ্যুতি, সেই অর্থে বাস্তুচ্যুত মানুষজনকে দুইটি ক্যাটাগরীতে ভাগ করা হয়-১। যারা বাস্তুচ্যুত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দেশের সীমানা পার করেছে, অর্থাৎ রিফিউজী এবং ২। যারা বাস্তুচ্যুত হয়ে নিজ দেশের মধ্যেই অবস্থান করছে। তারেদকে বলা হয় অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ বা IDPs এবং এই বাস্তুচ্যুতিকে বলা হয় অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতি। (হক ও ভোহ্‌রা, ২০০৩; বার্কল্যান্ড, ২০০৩; আকরাম, ২০০৩; হাজবুল্লাহ, ২০০৩) । অর্থাৎ, কারণ এক হলেও দেশের সীমানা পার হওয়া বা না হওয়াই যথাক্রমে রিফিউজী ও অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতকে সংজ্ঞায়িত করে (বার্কল্যান্ড, ২০০৩; হক এবং ভোহরা ২০০৩; হৌগ, ২০০৩)। যারা কিনা বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়েছে এমন প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমষ্টি হচ্ছে রিফিউজীরা। ১৯৫১ সালের কনভেনশন এবং 'রিফিউজীদের মর্যাদা' (Status Relating to Refugee) সম্পর্কিত ১৯৬৭ এর প্রটোকল অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে তবে সে রিফিউজীর মর্যাদা পাবে এবং তাই আন্তর্জাতিক সংগঠন সমূহ থেকে সুরক্ষা ও সহযোগীতা পাবে (আকরাম, ২০০৩: ৮০)। কিন্তু এই সংজ্ঞা সারা পৃথিবীতে বাস্তুচ্যুত হওয়া বিপুল সংখ্যক মানুষকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারে না কেননা সারা পৃথিবীতে প্রকৃতি ও মনুষ্য সৃষ্ট নানা কারণে দেশের অভ্যন্তরেও লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় (আবরার এবং লামা, ২০০৩; বার্কল্যান্ড, ২০০৩; আকরাম ২০০৩; সাদী ২০০৩; হিউম, ২০০৩; লিওয়া, ২০০৩; রশীদ ২০০৩)। এই প্রেক্ষিতে খুবই সাম্প্রতিক সময়ে, ১৯৯৭ সালে, অভ্যান্তরীন বাস্তুচ্যুতি (IDPs) আন্তর্জার্তিক ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইউ.এন. কমিশন অন হিউম্যান রাইটস এন্ড ইকোনোমিকসের ১৯৯৭ এর দেওয়া সংজ্ঞামতে, অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে তারা যারা ধর্মগত বা রাজনৈতিক কারণে হয়রানি ও নির্যাতনের ফলে, সশস্ত্র দ্বন্দ্ব এবং সহিংসতার ফলে তাদের বাড়ীঘর এবং পরিচিত পরিবেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং যারা নিজস্ব দেশের সীমানার চৌহদ্দীতেই থাকে (UNHCRA, ১৯৯৭)। খুবই সাম্প্রতিক সময়ে অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতি বা IDPs টার্মটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞা পেয়েছে। ১৯৯৮ সালের ইউ.এন কমিশন ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ইকোনমিক (UNHCR) এবং ইউ.এন. সোশ্যাল কাউন্সিলে (ECOSOC) অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতদের সম্পর্কে একসারি পথ নির্দেশনা মূলক মূলনীতি প্রনয়ন করা হয় যদিও সেগুলো আইন দ্বারা যুক্ত নয়। এই পথ নির্দেশক মূলনীতি সমূহ অভ্যান্তরীন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গের অধিকারের কথা বলে এবং

তাদের প্রতি সরকার, অ-রাষ্ট্রীয় এক্টরসমূহ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায় দায়িত্বের কথা বলা আছে (হৌগ, ২০০৩; গুহঠাকুরতা এবং বেগম, ২০০৫; বার্কল্যান্ড, ২০০৩)। অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতি সম্পর্কিত জাতিসংঘ সহায়ক নীতিমালা অনুযায়ী অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে "সেই ব্যক্তিবর্গ যারা তাদের বাড়ীঘর বা স্থায়ী আবাসস্থল ত্যাগ করতে বা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে সশস্ত্র সংঘাত, সাধারন শ্রেণীভূক্ত সহিংসতামূলক পরিস্থিতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রাকৃতিক কিংবা মনুষ্য ঘটিত দূর্যোগের কারণে কিংবা এসবের সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে এবং তা করতে গিয়ে যারা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করেনি" (OCHA, ১৯৯৬: ৬; বার্কেল্যান্ড, ২০০৩, ১৪০; হৌগ, ২০০৩ : ১৫৯; আকরাম, ২০০৩ : ৮০; গুহঠাকুরতা ও বেগম, ২০০৫)। জাতিসংঘ নীতিমালা আরও বলে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গের অধিকার তাদের রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং অবশ্যই তাদের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও দায়িত্ব আছে (গুহঠাকুরতা ও বেগম ২০০৫ : ৮)। জাতিসংঘ প্রণীত সংজ্ঞা বা অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার সকল কারনকে যথাযথভাবে অন্তভূক্ত করতে পারে কিনা তা নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। কারো কারো মতে, এই সংজ্ঞা দমন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সরকারী সাহায্যের অপর্যাপ্ততা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ সমূহ, উন্নয়ন কার্যকলাপ সমূহ ইত্যাদি অর্ন্তভূক্ত করে না (লান্ডলাম-টাইলর,১৯৯৮; আকরাম, ২০০৩; বার্কল্যান্ড, ২০০৩)। কিন্তু আমি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে কিভাবে "বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং আর্ন্তজাতিক সম্প্রদয়ের দায়িত্ব" এই বক্তব্য বলার মধ্যে দিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার কারণ অথবা পুরো প্রক্রিয়া থেকে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিসর নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, নিজেদেরকে অরাজনৈক ক্যাটাগরি হিসেবে উপস্থাপন করে। যেন ' সুরক্ষা' বা 'নিরাপত্তা' প্রদান করা ছাড়া কোন জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার প্রক্রিয়ায় এই প্রতিষ্ঠান সমূহের কোন ভূমিকা নেই। এই ইমেজ তৈরীর মধ্য দিয়ে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আবার একভাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানের উপরই নির্ভরশীল করে তোলা হয়। ঠিক যেমনটি লিসা মালকী (১৯৯২) হুতু রিফিউজিদের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে কিভাবে আর্ন্তজাতিকতাবাদ রিফিউজিকে টিকিয়ে রাখে সেই আন্তর্জাতিকতাবাই আবার কিভাবে রিফিউজিদেরকে আর্ন্তজাতিকতাবাদের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। মালকীর বিশ্লেষণ আবারও আসবে কেইস বিশ্লেষণ অংশে। এখন আসা যাক অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে এই প্রবন্ধে কিভাবে বোঝা হবে সেই প্রসঙ্গে।

এই প্রবন্ধে অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতিকে দেখা হবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় সীমানা পার হওয়া না হওয়ার মধ্যদিয়ে। অর্থাৎ কারণ যাই হোক না কেন যে ব্যক্তিবর্গ বা সমষ্টি সমূহ নিজ বাসস্থান বা পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেও নিজ রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে না তারাই অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ। আমার মনে হয় অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত হওয়ার কারণ গুলোকে নির্ধারিত করে ফেলা IDPs এর সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্নতাকেই

কেবল টিকিয়ে রাখবে, কেননা বাস্তুচ্যূতি নানা কারণে ঘটতে পারে আবার নতুন নতুন কারনেও হতে পারে অথবা যেমনটি লান্ডলাম- টাইলর (১৯৯৮) বলেছেন অনেকগুলো কারণের সমন্বয়েও ঘটতে পারে অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যূতি।

৩. বিভিন্ন সাহিত্যে বাস্তুচ্যূতি প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক নির্যাস অন্বেষণ

অধিকাংশ সাহিত্যে বাস্তুচ্যূতির প্রভাবের দিকে অতি মনোযোগ ও তার ফলে বাস্তুচ্যূতি প্রক্রিয়ার প্রতি উদাসিনতা বাস্তুচ্যূতির প্রক্রিয়াকে অরাজনৈতিক করে ফেলেছে। (উদাহরণ :চৌধুরী ও আজাদ;২০০৩; আকরাম, ২০০৩; সাদী,২০০৩) যেন বাস্তুচ্যূতির পেছনে রয়েছে কারণ সমূহের তালিকা,- বন্যা, ক্ষরা, নদী ভাঙ্গন, সেনা কর্তৃক অধিগ্রহন, যুদ্ধ ইত্যাদি, কোন সিষ্টেমেটিক প্রক্রিয়া নয়। যদিও এই বক্তব্য অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হচ্ছে প্রকৃতির কারনে ঘটা বাস্তুচ্যূতির বর্ণনা- বিশ্লেষনে । এই সাহিত্য গুলোতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগকে মানুষ কিভাবে মোকাবেলা করছে, আপোষ করছে ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায়। কিছু কিছু সাহিত্যে বাস্তুচ্যূত হয়ে পড়ার পর ক্ষমতার টানাপোড়ন, অধিনস্ততা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দিক উন্মোচিত হলেও খোদ বাস্তুচ্যূত হয়ে পড়াটাই যে রাজনৈতিক তার আলোচনা পাওয়া যায় না। যেমন, নদী ভাঙ্গনের কথাই যদি বলি, সাধারন ভাবে মনে হতে পারে এই বাস্তুচ্যূতির ঘটনায় মানুষের কোন হাত নেই। কেননা নদীর সর্বগ্রাসী ছোবলের কারণেই মানুষ বাস্তুচ্যূত হয়ে পড়ে এবং তার ফলশ্রুতিতে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সহ বিভিন্ন সংকটের মুখোমুখি হয় (আহমেদ, ১৯৯৩; হালদার, ২০০০; হালদার ও বুলবুল, ২০০১)। এটা সত্য, তবে চূড়ান্ত সত্য নয়। অর্থাৎ নদী মানুষকে ক্ষনস্থায়ী বাস্তুচ্যূততে পরিনত করতে পারে কিন্ত নদী ভাঙ্গনের কবলে পরা মানুষজন চূড়ান্তরুপে বাস্তুচ্যূত হয়ে পরে "শিকস্তি- পয়স্তি" আইনের ফলে (ভূইয়া, ২০০৭)। এই আইন মোতাবেক নদীতে পূনরায় চর জাগলেও সেই জমি ভাঙ্গন কবলিত মানুষজন ফিরে পায় না কারণ তা হয়ে যায় সরকারের সম্পত্তি। বিভিন্ন গবেষণা হতে দেখা যায়, নদী ভাঙ্গনের শিকার মানুষজন বিভিন্ন সংকট সমেত নদীর কিনারায় বা তার আশেপাশেই থাকতে পছন্দ করে এই আশায় যে নদীতে নতুন চর জাগলে তারা তাদের পূর্বেকার জমি/বসত ভিটা ফিরে পাবে (আহমেদ,১৯৯৩ হালদার,২০০০ হালদার ও বুলবুল,২০০১) এবং তাদের ভাসমান অবস্থায় কিংবা বাস্তুচ্যূত হয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু শ্লেষপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নদীতে নতুন চর জাগলেও শিকস্তি-পয়স্তি আইনের কারনেই সেই জমির মালিকানা আর তারা পান না কেননা তা সরকারের খাস জমি হিসেবে গন্য হয় আর এভাবেই তাদের চূড়ান্ত বাস্তুচ্যূতি ঘটে। সে কারনেই নদী ভাঙ্গনের মতো প্রাকৃতিক কারনে ঘটা বাস্তুচ্যূতিও রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে নয়। একই রকম ভাবে ক্ষরা, সুনামি, বন্যা ইত্যাদি কারনেও যদি মানুষের বাস্তুচ্যূতি ঘটে তাহলেও তার প্রক্রিয়া বিশ্লেষনাত্মক মানোযোগের দাবী রাখে কারন মানুষজন বাস্তুচ্যূত হয়ে পরার জন্য কারনের অপেক্ষা করে

না বরং তার উল্টোটা অর্থাৎ বাস্তুচ্যুত না হবার জন্য যুক্তি সমূহ দাড় করায় যেমন, সামাজিক মর্যাদা, জীবিকা, পরিচিত পরিমন্ডল ইত্যাদি কারনে নিজ স্থানেই থাকতে চায় যা বিভিন্ন গবেষণা থেকেই উঠে এসেছে (প্রাগুক্ত)। তারপরও যদি মানুষজন বাস্তুচ্যুততে পরিনত হয় তার পেছনে ব্যবস্থা, ক্ষমতার জটিল প্রক্রিয়া যুক্ত থাকে যা মনোযোগী অধ্যয়নের দাবীদার।

মানুষের হস্তক্ষেপে ঘটা বাস্তুচ্যুতি প্রসঙ্গে যে সাহিত্য গুলো রয়েছে সেখান থেকে জানা যায় যে যুদ্ধ, সশস্ত্র সংঘর্ষ, সেনা অধিগ্রহন, উন্নয়ন কার্যকলাপ ইত্যাদি হচ্ছে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার মূল কারন। যেসকল সাহিত্য এই বিষয় গুলোর উপর মনোযোগ দিয়েছে সেগুলো সরাসরি বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দিকে মনোযোগ না দিলেও খোদ যুদ্ধ, সশস্ত্র সঘর্ষ, উন্নয়ন হচ্ছে রাজনৈতিক ক্যাটগরি। তাই অনায়াসেই এই সকল সাহিত্য থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার প্রক্রিয়া গভীর ও বিস্তৃত ভাবে বোঝা না গেলেও বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার পেছনে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিহিত তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। কেননা যুদ্ধ, সংঘর্ষ কিংবা উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাজনৈতিক, মতাদর্শিক কারন নিহিত থাকে, ইতিহাস অন্তত তাই বলে। তাই এ সকল কারনে ঘটা বাস্তুচ্যুতিকে রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে ভাবার সুযোগ নাই এবং এই রাজনৈতিক পরিসরে আবার স্থানীয় ও বৈশ্বিক রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবারও সুযোগ নাই। অবশ্য এর পাশাপাশি দুই একটি এমন সাহিত্যও খুজে পাওয়া যায় যেখানে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার রাজনীতির দিকে, প্রক্রিয়ার দিকে গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এই সকল ধরনের সাহিত্যের সাহায্যে অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া উন্মোচনের চেষ্টা করা হবে। যেমন, "অরণ্যের অধিকারে" মাহাশ্বেতা দেবী (১৩৪৮ বাং) গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তুলে ধরেছেন মুন্ডা জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতি প্রক্রিয়াকে। বৃটিশ উপনিবেশের ফলে মুন্ডা জনগোষ্ঠী নিজ ভূমি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে পরে এটি এমন সরল গল্প নয়, বরং মহাশ্বেতা দেবী দেখান যে চুটিয়া গ্রাম মুন্ডারা পত্তন করলেও উপনিবেশিক সময়কালের আইন তাদেরকে পর্যায়ক্রমে নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দেয়। জঙ্গল ছিল মুন্ডাদের জীবন ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত। যে জঙ্গলের উপর তারা পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল বলে জঙ্গল ছিল তাদের মা। যে জঙ্গলে তারা শিকার করত, গাইচরাত, কাঠপাতা আনত, জঙ্গল কেটে জমি আবাদ করে নিত। এমনকি তীর ধনুক দিয়ে যে তারা যুদ্ধ করত সেই তীর ধনুক সহ তীরে মাখানোর বিষও সংগ্রহ করত জঙ্গল থেকে, সেই জঙ্গল থেকে তাদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন সেই জঙ্গলের মালিকানা নিয়ে নেয় উপনিবেশিক সরকার। সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষনার মধ্য দিয়ে বনের মধ্যে মুন্ডাদের অনুপ্রবেশ সীমিত করে দেয়া হয় বনের প্রতি বৃটিশ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও বন থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ভোগের জন্য। তাতে করে মুন্ডাদেরকে তাদের ঐতিহ্য থেকে, জীবন- জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। কোন জনগোষ্ঠীকে মূলোৎপাটিত করে

ফেলার গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে তাদের ঐতিহ্য থেকে উচ্ছেদ করে ফেলা যা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করা হয়েছে, হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দেশের অন্যান্য স্থান থেকে মানুষ এসে মুন্ডাদের বসতিতে, জঙ্গলে ভিড় করেছিল। তারা মুন্ডাদের উচ্ছেদ করে তাদের জমি জেরাত দখল করে নিয়েছিল এবং তাদের কাছেই মুন্ডারা বিনা মজুরীতে বেগার খাটতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া আড়কাঠির মাধ্যমে উচ্ছেদ হওয়া মুন্ডাদের অনেককে চা বাগানে কুলি কাজের লোভ দেখিয়ে এমন দূরে নিয়ে চলে যেত যেখানে পথ না চেনার কারণে আর তারা ফিরে আসতে পারত না। মহাশ্বেতা দেবী স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন যে কিভাবে মুন্ডাদের জীবনে মহাজন, জমিদার, মিশনারী, জেলকাছারি, বাধানো রাস্তা, রেলগাড়ি, বেয়নেট, বন্দুক, খরা, অনাবৃষ্টি, দূর্ভিক্ষ, আড়কাঠি, বৈঠবেগারী ঢুকে গিয়েছিল এবং এই প্রত্যেকটি বিষয় সিষ্টেমেটিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তাদের উচ্ছেদে ।

একইরকম ভাবে , বাংলাদেশের পার্বত্য চট্রগ্রামে কাপ্তাই বাধ নির্মান, বাঙ্গালী বসতি স্থাপন, সংরক্ষিত বনায়ন, সেনা ক্যাম্প স্থাপন ইত্যাদি হচ্ছে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার সিষ্টেমেটিক প্রক্রিয়া। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী সেটলারদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় পাকিস্তান আমল থেকেই। এই সময়কালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মান বহু পাহাড়ি মানুষের জীবন যাপনকে উপড়ে ফেলে (চাকমা, ২০০৫)। এর ফলে আদিবাসীদের ঘরবাড়ি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, চাকমা রাজবাড়ী ডুবে যায়। লক্ষ পাহাড়ী পরিবার ভূমিহারা হয়। এ বাঁধ নির্মানের ফলে ৪০% কৃষি জমি, যার অধিকাংশই ধানক্ষেত, তলিয়ে যায়। ১৯৭৫ এর পরবর্তীতে বাঙালী সেটলারদের অনুপ্রবেশ অভূতপূর্ব ভাবে ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় পাহাড়িদের নিজ ভূমি ও ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৪% সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষনা করা হয়। যার ফলে পাহাড়ী মানুষজনের ঐতিহ্যগত ধরনে কৃষিকাজ ব্যহত হয় এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষনার ফলে তারা ঐ জমির উপর থেকে তাদের অধিকার হারায় ও বাস্তুচ্যূততে পরিণত হয় (হিউম, ২০০৩)

অরুন্ধতি রায় চৌধুরী (২০০০) ভারতের গড়াই উপত্যকায় সেখানকার জেলে সম্প্রদায়ের সিষ্টমেটিক বাস্তুচ্যুতি প্রক্রিয়াকে তুলে ধরেন। তিনি দেখান গড়াই উপত্যকায় বিনোদন পার্ক এসেল ওর্য়াল্ড নির্মাণ ও তার সাথে যুক্ত অন্যান্য প্রক্রিয়া যেমন, সমুদ্রে জেলেদের অনুপ্রবেশ সীমিত করে দেয়া, তাদেরকে স্বাদু পানির সংকটে ফেলানো, বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, ভূগোল পরিবর্তনের মাধ্যমে সেখানকার ইতিহাস পূণঃনির্মাণ করা ও তার ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের অবৈধ অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা ইত্যাদি হচ্ছে সেখানকার অধিবাসীদের বাস্তুচ্যুত করে ফেলার প্রক্রিয়ার অংশ। যা আমাদেরকে কোন্ পর্যায়ে, কেন মানুষ প্রতিরোধ করে শুধু তাই বুঝতে সাহায্য করে না

বরং একই সাথে এটি বুঝতেও সাহায্য করে যে কোন্ প্রক্রিয়ায়, কিভাবে মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে।

বার্মার ক্ষেত্রে দেখা যায় সেখানকার 'বার্মানাইজেশন' প্রক্রিয়া অনেক আদিবাসীকে বাস্তুচ্যুততে পরিনত করেছে (লেওয়া,২০০৩)। ক্রাইস লেওয়া তার আলোচনায় দেখান যে বার্মাতে যদিও মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে এথনিক জনগোষ্ঠী তথাপি "বার্মানাইজেশন" প্রকল্পের মাধ্যমে সকল বৈচিত্রপূর্ন এথনিক সংস্কৃতি ও মানুষজনকে মূলধারার বার্মান সংস্কৃতিতে জোরপূর্বক একীভূত করার চেষ্টা করা হয় এবং এই কাজে দৃঢ় ভাবে নিয়োজিত রয়েছে বার্মিজ মিলিটারী। এথনিক গোষ্ঠী সমূহ এই একীভূতকরণের বিরোধীতা করেন। ফলে তারা বার্মিজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরেন। এর ফলশ্রুতিতে বার্মিজ মিলিটারী ও অ-বার্মীয় এথনিক গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে ৫০ বছরের গৃহযুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি ঘটে। বার্মাতে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত হয় এবং প্রায় আরো এক লক্ষ মানুষ আন্তর্জাতিকভাবে দেশীয় সীমানা পার হয়ে থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ অথবা ভারতে "রিফিউজী" অথবা "অবৈধ অভিবাসী" হিসেবে চলে যায়।

বার্মাতে বিভিন্ন ধরনের জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি ঘটে। লেওয়ার মতে, এগুলোর মধ্যে সবচাইতে নিষ্ঠুরতম পদ্ধতি হচ্ছে আর্মি দ্বারা "Strategic hamleting" এবং সন্ত্রাস অথবা অর্থনৈতিক কূটাঘাতের মাধ্যমে মানুষজনকে সরিয়ে দেওয়া। এই নীতিকে বলা হয় "The 4 cuts" নীতি, যার লক্ষ্য হচ্ছে যেন গ্রামবাসী অস্ত্রসজ্জিত বিরোধী সমষ্টি সমূহকে কোন সাহায্য করতে না পারে। "Strategic hamleting" পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রামের একটি গোষ্ঠীকে জোরপূর্বক স্থানচ্যুত করা হয় এবং মিলিটারী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নজরবন্দি করে রাখা হয়। বার্মার এথনিক এলাকা গুলোতে এই কৌশল ৭০ এর দশক থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এবং ১৯৯৬ থেকে এই কৌশল ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কৌশলের মাধ্যমে গ্রামবাসীকে তাদের গ্রাম থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে নজরবন্দি করে রাখার মাধ্যমে সকল সম্ভাব্য প্রতিরোধকে দূর করার চেষ্টা করা হয়। এই কৌশলের মাধ্যমে বিশাল ভৌগলিক এলাকা থেকে সকল মানুষজনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক হিসাব মতে, প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার মানুষকে ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়ায় স্থানচ্যুত করা হয়েছে এবং এই কৌশল এখনও চলমান রয়েছে (লেওয়া, ২০০৩ : ১৭০-১৭১)। "Strategic hamleting" কৌশল বর্ণনায় লেওয়া বলেন, নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকা থেকে মানুষজনকে মিলিটারীদের নজরবন্দী করে রাখার স্থানে চলে আসার জন্য তিন থেকে সাত দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এই গ্রামবাসীর অধিকাংশই হচ্ছে এথনিক জনগোষ্ঠী যারা শ্ল্যাস এন্ড বার্ন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করেন। তারা হঠাৎ করেই তাদের পূর্বপুরুষের জমি থেকে মূলউৎপাটিত হয়। তারা তাদের সাথে কোন জিনিসপত্র নিয়ে আসার সময় পায় না। তাদের বাড়ীঘর, মাঠ, জীবিকার একমাত্র উৎস ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অনেক সময়

নতুন স্থানে পৌছানোর জন্য তাদের কয়েকদিন হাটতে হয় কিন্তু তাদেরকে কোন পরিবহন দেওয়া হয় না। নারী প্রধান পরিবারের নারীরা কোন রকম ভাবে তাদের শিশুদের সাথে করে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পরিবারের বয়জৈষ্ঠ্যগণ এবং যারা হাটতে পারেন না তাদেরকে তারা ফেলে যেতেই বাধ্য হয় এবং তারা গ্রামের মধ্যে অনাহারেই মারা যায়। নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে যাবার বেঁধে দেওয়া সময় সীমার পর সেই এলাকা "free-fire" জোন হয়ে যায়। অর্থাৎ, তখন কোন গ্রামবাসীকে দেখামাত্র গুলি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া সময়ের পর পুরো এলাকায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, খালি বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়, চালের গুদাম ধ্বংস করা হয় এবং গ্রামবাসী যেন পূনরায় ফিরে আসতে না পারে সে জন্য ফাঁদ পেতে রাখা হয়। লেওয়া আরো দেখান যে, যখন মিলিটারী গ্রামবাসীদের নির্ধারিত স্থানে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় তখন কেউ কেউ সেখানে যায় না। তিন/চার/পাঁচটি পরিবার একত্রিত হয়ে পাশের জঙ্গলে আশ্রয় নেয় যাতে তারা আবার তাদের মাঠে ফিরে এসে বেঁচে থাকার জন্য কিছু খাদ্য দ্রব্য নিয়ে যেতে পারে। তারা খুবই ঝুকি নিয়ে দৌড়ের উপরে থাকে কেননা যেহেতু তাদের গ্রাম "free-fire zone" হয়ে যায় সুতরাং তাদের দেখা মাত্র মিলিটারীরা গুলি করতে পারে। বার্মার শান স্টেইটে সমগ্র গ্রামবাসীকে "free-fire zone" এর মাধ্যমে গত দুই বৎসরে নির্দয় ভাবে গণহত্যা করা হয়। এদের অনেকেই জঙ্গলের পথ ধরে মাটির নিচে পেতে রাখা মাইন সাবধানে এড়িয়ে থাইল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত রিফিউজী ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। যারা রিফিউজী ক্যাম্পে আশ্রয় পায় না তারা অবৈধ অভিবাসী হিসেবে থাইল্যান্ডে বিভিন্ন ফার্মে, ফ্যাক্টরীতে, নির্মাণ ক্ষেত্রে, পতিতালয়ে সস্তা শ্রম দিতে বাধ্য হয়।

তিনি আরো বলেন সারা দেশ জুড়ে মিলিটারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্পের নামে অন্যান্য ধরনেরও জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি ঘঠে। মিলিটারীদের উদ্দেশ্য রাস্তা, রেললাইন, বাঁধ, পাইপলাইন, বিমানবন্দর, বন প্রকল্প ইত্যাদি নানা কিছু নির্মাণে, মিলিটারীদের স্বার্থে স্থানীয় মানুষজনদের বিতড়ন করা হয়। তিনি বলেন গ্রামীন উন্নয়নের নামে যে রাস্তা তৈরী করা হয় তার উদ্দেশ্য গ্রামীন উন্নয়ণ নয়, বরং তা এমন নকশা করে তৈরী করা হয় যাতে দূরবর্তী অঞ্চলেও মিলিটারী প্রবেশ করতে পারে। এছাড়াও আর্মি বিস্তৃতির জন্য নতুন আর্মি ব্যবস্থা ও সুবিধা প্রয়োজন হয়, যা পূরণ করা হয় গ্রামের মানুষজনকে কোন ধরনের ক্ষতিপূরণ ছাড়াই উচ্ছেদ করে। এছাড়াও বার্মার শহুরে এলাকায় তথাকথিত "নান্দনিকতা" বাড়ানোর নামে বার্মান জনগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী উভয়ই উচ্ছেদ হয়।

একই রকম ভাবে শ্রীলংকাতে, লান্ডের আলোচনা হতে পাওয়া যায়, সিনহালিস ও তামিলদের মধ্যকার ভূ-খন্ডের উপর নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংঘর্ষ ভেদাদের সহ অন্যান্য অনেক আদিবাসীদের বাস্তুচ্যূততে পরিনত করেছে (লান্ড,২০০৩)। লান্ডের মতে,

শ্রীলংকার দুই প্রধান এথনিক গোষ্ঠী সিনহালিজ ও তামিলদের ন্যাশনালিস্টিক মতাদর্শ থেকে দ্বন্দ্ব তৈরী হয়। যেখানে প্রত্যেকেই শ্রীলংকাকে নিজ পূর্বপুরুষের ভূমি হিসেবে দাবী করে, ভূ-খন্ডের অধিকারের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, হত্যা পরিচালনা করে। সিনহালিজরা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে আর তামিলরা দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আগায়। যার ফলে এথনিক জনগোষ্ঠী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাকে লান্ড বলছেন "ethnic cleansing" । ল্যান্ডের মতে এই দ্বন্দ্ব, যুদ্ধের ফলে অন্যান্য এথনিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জীবনও ব্যবহারিক ভাবে কিংবা প্রতীকিভাবে প্রভাবিত হয় এবং এই যুদ্ধ দ্বন্দ্বের ফলে অনেক মানুষ জনকেই স্থানচ্যুত হতে হয়। কিন্তু ল্যান্ড গবেষণা করেন শ্রীলংকায় ভেদাদের উপর যারা একাধিকবার বাস্তুচ্যুত, বঞ্চিত, খন্ডিত হয়েছে।

তিনি দেখেন তিনটি স্তরে ভেদাদের পরিচিতি ও জীবীকায় রূপান্তর ঘটেছে। **প্রথম স্তরটি** ছিল উপনিবেশিক সময়কালে (১৯৪৮ পর্যন্ত) যখন তাদেরকে তাদের 'জঙ্গল জীবন' থেকে নিয়ে এসে দেশের উত্তরপূর্ব দিকে কৃত্রিম লেকের পাশে পূর্নবাসন করা হয়। উপনিবেশিক দৃষ্টি ছিল জঙ্গলবাসী থেকে তাদেরকে 'সভ্য মানুষে' রুপান্তরিত করা। উপনিবেশিক শাসন কালেই ভেদাদের স্থানান্তর কৃষি, শিকার ইত্যাদি কার্যক্রম গুলো বাধাগ্রস্থ হয়। **দ্বিতীয় স্তর** শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালে (১৯৪৮-১৯৭০) যখন অনেক ভেদাকে বাজার মুখী কৃষি অর্থনীতিতে পূর্ণবাসন করা হয় ও মজুরী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। স্থানান্থর কৃষিতে অভ্যস্ত ভেদাদের এই নতুন বাজারমুখী কৃষিতে ভালভাবে অভ্যস্ত হতে সমস্যা হয়। তথাপি তারা ভাল নাগরিক হওয়ার জন্য রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্বকে মেনে নেয়। তিনি বলেন, রাষ্ট্রে ভেদাদের সভ্য করার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভেদাদের 'শিক্ষিত' করা। তৃতীয় স্তর হচ্ছে ১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দশকের মাহাওয়েলী নদীর সেচ ট্যাংকের পূনঃ নির্মান সারা দেশের ভূমিহীন, দরিদ্র পরিবারের পূর্ণবাসান করা এবং অর্থকরী ফসলের উৎপাদন ইত্যাদি নানা কারনে ভেদাদের বাসস্থান নিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া মাদুরু অয়া ন্যাশনাল পার্ক সংরক্ষিত বনায়ন হিসেবে রাখা হয় যার মাধ্যমেও চার হাজার ছয়শত ষোল জন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। ফলে আধিপত্যশীল জনগোষ্ঠীর দাপটে তারা ছোট বোধ করে। নতুন স্কুল ব্যাবস্থা দাপ্তরিক শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম, সিনাহালিজ ভাষা প্রভৃতির দাপটে তারা সংকুচিত হয়ে পড়ে। লান্ডের মতে, এই তিন স্তরের বাস্তুচ্যুতিতে ভোদারা প্রায় নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস হয়ে গেছে।

'অসভ্য', ' আদিম' মানুষ গুলোকে 'সভ্য' করে তোলার রাজনীতি ও তার ফলে এই মানুষ গুলোকে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে, জীবন- জীবিকা থেকে আলাদা করে ফেলা, এবং বাজারের প্রতি নির্ভরশীল করে তোলা এবং এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে অধিনস্ত করে তোলা ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গুলো তো খুবই চেনা পরিসর। তাই বাস্তুচ্যুতিকে কেবল কারন সমূহের তালিকা দিয়ে বোঝাটা অসম্পূর্ন, খন্ডিত থেকে যায়। তাই বাস্তুচ্যুতি

প্রক্রিয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তচ্যুত হয়ে পড়া মানুষজনের নিরাপত্তাদানকারী হিসেবে আমেরিকা সহ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংগঠন সমূহের ইমেজ আমদেরকে ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যে কেন সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। বৈশ্বিক রাজনীতির দিকে মনোযোগ দিলে স্পষ্ট হয় কিভাবে পাকিস্তান, সুদান, আফগানিস্তান, ইরাক সহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। আফগানিস্তানে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র নামে যে মার্কিন প্রশাসন ও তেল কোম্পানির গুলোর উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানের তেল আত্নসাৎ করা (হক ও ফাতিমা,২০০৩) তা তো এখন সবারই জানা। 'নিউক্লিয়ার মিসাইল ও নানা ধরনের মরনাস্ত্র প্রতিহত করতে, স্বৈরাচারী আগ্রাসী সাদ্দাম হোসেনকে নির্মূল করতে ইরাকে যুদ্ধ' ইত্যাদির ব্যানারের পেছনে যে আসলে ছিল ইরাকে বিপুল পরিমান মজুদ তেলের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করা সেই গল্পও তো অজানা নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তালেবানদের মধ্যকার সংর্ঘষে প্রায় ১৩০,০০০ সোয়াত বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছে। তালেবানদের প্রতিহত করতে পাকিস্তান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র ব্যবহার করেছে। কেউ কেউ সোয়াতদের এই ভোগান্তির কারণ হিসেবে ইসলাম ধর্মান্ধতাকে দায়ী করেছেন (উদাহরন, আর্সেনল্ট, ২০০৯)। আল -কায়দা দায়ী করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথারীতি আল -কায়দাকে। মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি জনাব হলব্রুক বাস্তচ্যুত হওয়া সোয়াতদেরকে আখ্যায়িত করেছেন ভারগ্রস্ত দেশের 'বোঝা' হিসেবে এবং এই 'বোঝা' বহনে পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন প্রশাসনের সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। কিন্তু কেন সোয়তরা হঠাৎ করে 'বোঝা' হয়ে পড়লো সেই ব্যখ্যা কে দিবে?

সুদানে যে দীর্ঘ চলমান সংকট, যুদ্ধ তার পেছনেও রয়েছে বিদেশী, মূলত কানাডিয়ান তেল কোম্পানি গুলোর,যেমনঃ তালিসমান, আরাকিস, নাইল, শেভরন, আই, পি, সি প্রভৃতির হস্তক্ষেপ। যদিও সুদানে চলমান অন্যান্য কারণ সমূহের মধ্যে গনতন্ত্র, মানবাধিকার, ধর্ম ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণ সমূহও গুরুত্বপূর্ন কিন্তু প্রধান কেন্দ্রীয় কারণ হচ্ছে বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানি সমূহের তেল উত্তোলন কার্যক্রম ও তার ফলে হাজার হাজার মানুষের বাস্তুচ্যত হয়ে পড়া, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়া। গবেষনা রির্পোট হতে জানা যায় সুদানে অধিকাংশ বাস্তুচ্যুতিই তেল উত্তোলনের সাথে সম্পর্কিত (টাইলর ও ফ্রান্সিস, ২০০০)। স্থানীয় মানুষজন মনে করছেন কানাডিয়ান তেল কোম্পানি সমূহ, কানাডিয়ান সরকার ও সুদানের সরকার সম্মিলিত ভাবে দায়ী এই সার্বিক পরিস্থিতির জন্য এবং তারা তেল উত্তোলনের সাথে তাদের ইতিবাচক উন্নয়ন নয় বরং সীমাহীন দুঃখ দূর্দশা দেখছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, স্থানীয় মানুষজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও এত বিদেশী তেল কোম্পানি কেন থাকে সুদানে? যে উন্নয়নের কথা বলে তেল উত্তোলন করা হচ্ছে হাজার হাজার মানুষজনকে

বাস্তুচ্যুত করে, যা মানুষজন চায় না, সেই উন্নয়ন চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা কেন? তালিসমানের পৃথিবীর এক নম্বর তেল ও গ্যাস কোম্পানি হয়ে উঠার স্বপ্ন পূরনের জন্য? বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার পরে কেন, কেন তথাকথিত 'সুরক্ষাকারী' দেশ বা প্রতিষ্ঠান সমূহ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়া থেকে কিংবা সীমাহীন দুঃখ দূর্দশা, সংকটে পড়া থেকে মানুষজনদেরকে সহায়তা করে না? যদি করে তাহলে 'সুরক্ষাকারী' দেশ সমূহের জন্য মুনাফা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়? যদিও কানাডিয়ান সরকার সাম্প্রতিক সময়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে, যদি সুদানে কোন মানবাধিকার বা মানবিক আইন লঙ্ঘনের তথ্য প্রমান পাওয়া যায় তবে তা অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা আরোপ করবে (টাইলর ও ফাসিস, ২০০০)। মাটির নীচের তেল ও তার মধ্যে দিয়ে মুনাফার ঝলকানি দেখতে সময় লাগে না আর মাটির উপরে চলা দৃশমান যুদ্ধ, গনহত্যা মানুষজনকে মূলৎপাটন করে দেয়া, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের লোকলয়ে হস্তক্ষেপ করা ও এই সকল কিছুর মাধ্যমে দুঃখ দূর্দশাময় অনিশ্চিত ভবিষ্যত তৈরী করা যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করাই হয় তা বুঝতে কানাডিয়ান সরকারের এত দীর্ঘ সময় লাগে? তার মানে কি এই যে, বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার পর 'সুরক্ষাকারী বন্ধুরা' আছেন কেননা তাতে করে তাদের সার্বিক কার্য উদ্ধার হয়ে যায়, বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ার আগে নয় কেননা তাতে করে কার্য ব্যহত হতে পারে? তাই এই সকল বিষয় গভীর মনোযোগের দাবীদার তা না হলে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়াটাই যে রাজনৈতিক ফলাফল তা আড়াল হয়। অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই মানুষজন নিষ্ক্রিয় ভাবে বাস্তুচ্যুতি প্রক্রিয়াকে মেনে নেয় না বরং প্রতিরোধ করার উদাহরণও সমান তালে বিভিন্ন সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে প্রতিরোধের আলোচনার সুযোগ কম। নিচের কেইসটি ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাস্তুচ্যুতি প্রক্রিয়ার রাজনেতিক রুপকে বুঝতে সাহায্য করবে।

৪. কেইসঃ চাকুলীবাসীর বাস্তুচ্যুতি প্রক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ

চাকুলী প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। ১৯৬৪-৬৫ সালে পাকিস্তান আমলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত চাকুলী এলাকা থেকেও অনেক হিন্দু দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান (নাহার,১৯৯৪)। তাদের মধ্যে কেউ কেউ জমি বিক্রি করে গেলেও অনেকেই জমি ফেলে রেখে চলে যেতে বাধ্য হন। এই সময়কালে অধিবাসীদের অনেক জমি হুকুম দখল করা হয়। বৃহত্তর হুকুম দখলকারী ছিলেন 'ইস্টার্ন হাউজিং এর মালিক জহুরুল ইসলাম । সেখানে একটি উপশহর নির্মাণের জন্য জহুরুল ইসলাম এবং তৎকালীন সরকার এল. এ. কেইস (ল্যান্ড একুইজেশন কেইস) ৯০/৬৫-৬৬ দাখিল করেন। জমির মালিকগণ এই হুকুম দখলের বিরুদ্ধে মামলা করলে হাইকোর্ট এল.এ. কেইস ৯০/৬৫-৬৬ ভুক্ত সকল সম্পত্তি অবমুক্ত করার পক্ষে রায় দেন। ফলে জহুরুল ইসলাম এবং তৎকালীন সরকার এই মামলায় হেরে যান এবং জমি মালিকগণ তাদের জমি ফিরে পান (হাসান, ২০০৫)। ১৯৭১ সালে পাক হানাদাররা বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত তাদের ঘরবাড়ি

পুড়িয়ে দেয়, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই সময়ও অনেক হিন্দু পরিবার তাদের জমি বিক্রি করে অথবা ফেলে রেখে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতে চলে যান।এখানে উল্লেখ্য ১৯৭১ সালে বিশেষ রাজনৈতিক, মতাদর্শিক কারণে তাদের ঘরবাড়ী, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন তার ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আজ অবধি বিদ্যমান। ১৯৭১ সালের পর পরই সরকার নতুন আরেকটি কেইস, এল.এ. কেইস ৫/৭২-৭৩ এর মাধ্যমে পুনরায় সেই জমিগুলোর উপর হুকুম দখল দেখায় এবং সেই জমি সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দ করে। এই সময়কালে (১৯৭২ সালে) মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করা হয় ও তার আশেপাশের বিভিন্ন দাগের ২৬ একর এলাকা অবসর প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার এই প্রেক্ষিতে চাকুলী-বাসীদের কোন নোটিশ প্রদান করে নাই এবং কোন পূর্নবাসন কিংবা ক্ষতিপূরনেরও প্রস্তাব দেয় নাই। সরকারের এহেন পদক্ষেপ যে প্রশ্নের উদ্রেক করে তা হচ্ছে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাটিই কেন? সামরিক বাহিনীর জন্যই কেন? কারণটা কি এই যে তাহলে কোন উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করার রাস্তাটা সহজ হয়। ২০০১ সালে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে চাকুলীবাসী প্রথম জানতে পারেন যে, তারা বংশ পরম্পরায় রেকর্ড পর্চায় উত্তরাধিকার সূত্রে স্বত্ববান হওয়া সত্ত্বেও তাদের জমি হুকুম দখল করা হয়েছে। এর আগ পর্যন্ত জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত কোন নোটিশ তারা পাননি বলে তথ্যদতাগন জানান। হুকুম দখল সম্পর্কে জানার পর তারা এল.এ. কেইস ৫/৭২-৭৩ এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন, যা এখনও পর্যন্ত বিচারাধীন রয়েছে এবং উক্ত মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্ট চাকুলী মৌজায় ১-১৪৩ নং দাগের অধীন সমস্ত জমির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তথাপি সামরিক বাহিনী সেখানকার জমি মালিকসহ অধিবাসীদের উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রচেষ্টা খুব জোরদার ভাবে শুরু হয় ২০০৩ সালের "অপারেশন ক্লিনহার্ট"[১] অভিযানের সময়কালে। অপারেশন ক্লিনহার্টের মাধ্যমে যেহেতু সেনারা প্রত্যক্ষ ক্ষমতা পায় তাই নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনও তখন সহজ হয় এবং তারা বিশেষত চাকুলির পুরুষদেরকে গ্রেফতার করা শুরু করে। সেই সময় চাকুলীর অধিকাংশ পুরুষ অধিবাসী গা ঢাকা দিতে বাধ্য হন। "অপারেশন ক্লিনহার্ট" এর সময়কালের সুযোগ ব্যবহার করে ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ জোর পূর্বক চাকুলী পুরান বাড়ীর সকল অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে দেয় এবং অনেক জমি দখল করে নেয়। এর পর ২০০৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে আর্মিরা এসে কোন রকম পূর্ব নোটিশ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই বুলডোজার দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক ঘর বাড়ি গুড়িয়ে দেয়। যে ঘরবাড়ি গুলোর অধিকাংশই,তথ্যদাতাদের দেওযা তথ্যমতে, হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত জমির অংশ। ঐ দিন আর্মিরা সকালে যখন উচ্ছেদ করতে আসে তখন অধিকাংশ পুরুষ কর্মক্ষেত্রে ছিল। আর্মিরা তখন কারো কোন অনুরোধ শুনে নাই বরং উচ্ছেদে বাধা দিতে আসলে তারা গ্রেফতার করার হুমকি দেয় এমন কি গালিগালাজও করে (হাসান, ২০০৫) যা ক্ষমতা সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে।

এরপর ২০০৭ সালের জুন মাসের ৬ ও ১৩ তারিখ সহ দফায় দফায় হুমকী দেওয়া সহ সদলবলে উচ্ছেদ করতে আসার ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ২১শে জুন ২০০৭ সালেও তারা উচ্ছেদ করতে আসে। ঐ দিন আর্মিরা সদলবলে উচ্ছেদ করতে আসে এবং চাকুলীদের অবৈধ অভিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে। অবৈধ অভিবাসী প্রমান করতে পারলে বাস্তুচ্যুত করার কাজ যেন অনেক সহজ হয়ে যায়। মাগুরছড়ায় খাসিয়া জনগোষ্ঠীকেও অবৈধ অভিবাসী প্রমানের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে প্রমান পাওয়া যায়, যেমন প্রমান পাওয়া যায় ভারতের গড়াই উপত্যকার জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, তেমটি চাকুলির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এখানে রেকর্ড পর্চায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তিকেও অবৈধ দখল হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। । তখন অধিবাসীগনের সেই বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ করতে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সুলতানা কামাল সহ বিভিন্ন মানবাধিকার কর্মী সেনা প্রধানকে অনুরোধ করলে ৩০ শে আগষ্ট ২০০৭ সাল পর্যন্ত অধিবাসীদের এলাকা ছাড়তে সময় বেধে দেওয়া হয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে[২]। এই আদেশের বিরুদ্ধেও অধিবাসীগণ মামলা দায়ের করেন এবং সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তা অস্বীকার করা হলে তা স্থগিত হয়। এরপর ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখে সামরিক বাহিনী সদলবলে আবার চাকুলীবাসীদের উচ্ছেদ করতে আসে। তখন তারা কিছু বাড়িঘর ভেঙে দিয়ে চলে যায় এবং আবারও উচ্ছেদ করতে আসবে এবং চাকুলীবাসীদের সেই জায়গা ছেড়ে যেতেই হবে বলে হুমকি, ভয়ভীতি দেখানো হয়। তথ্যদাতাদের দেয়া তথ্য মতে, অপারেশন ক্লিন হার্ট সময়কালের পরবর্তীতে তাদের উচ্ছেদ করার হুমকী, ভয় ভীতি দেখানো ইত্যাদি আবারও তোড়জোড় ভাবে শুরু হয় ২০০৭ এর সময় কালে। এই কালটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, এটি এমন এক সময় যখন বাংলাদেশে তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে দেশে জরুরী অবস্থা চলছিল। যে সময়কালেও আর্মিদের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা ছিল বলে অনেকের অভিমত।

শুধু তাই নয়, গবেষণায় পাওয়া তথ্য মতে সামরিক বাহিনী কোন প্রচারনার মাধ্যমে এই বাস্তুচ্যুতির ঘটনা প্রচারে বাধা দেয়। সেটা এই কারনে যে মিডিয়া যদি জানে, তাহলে সংখ্যালঘু নির্যাতন, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি নানা ইস্যুতে সামরিক বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিসরে সমালোচনার মুখোমুখি হবে। এছাড়া চাকুলিতে সামরিক বাহিনীর জন্য বহুতল ভবন নির্মান করা এই বাস্তুচ্যুতি প্রক্রিয়ার অংশ কেননা সামরিক বাহিনীর জন্য নির্মিত এই বহুতল ভবন গুলো বাস্তুচ্যুতি করার প্রতিকী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এই বহুতল ভবন গুলোর বিপরীতে চাকুলী বাসীদের রয়েছে কাঁচা মাটি, টিন ও বেড়ার তৈরী ঘর যা ঝড়ে পরে গেলে পুনরায় বেধে নেবার বা ঠিকঠাক করার অনুমতি তারা পায় না। বুলডোজারে গুড়িয়ে দেওয়া ভিটের মাটি সমতল করে ফেলা হয় যাতে পুনরায় সেখানে ঘর তুলতে না পারে চাকুলি অধিবাসী। এই সকল কিছুই একটা জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যূত হবার পেছনে যুগপৎ ভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যা কেবল মাত্র

কারন উল্লেখ করে আলোচনা করলে বিষয়ের গভীরতা বা প্রক্রিয়ার গভীরতা মাপা সম্ভব হয় না। সেই প্রক্রিয়ার বোঝাবুঝিটাও অসম্পূর্ণ থেকে যায় যে প্রক্রিয়ার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নিজস্ব বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। জাতিসংঘ নীতিমালা যদিও অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যূত ব্যক্তিবর্গের প্রতি সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদয়ের দায়িত্বের কথা বলে কিন্ত চাকুলিবাসী যেহেতু অভ্যন্তরীন বাস্তুচূতিতে পরিনত হননি তাই যেন কারোরই কোন দায়িত্ব নেই। যেহেতু তারা প্রদত্ত সংজ্ঞার আওতায় পড়ছেন না, তারা বাস্তুচ্যূত হয়ে পড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন বাস্তুচ্যূত হয়ে পড়েননি এখনও। বাস্তুচ্যূত প্রতিরোধে কোন রকম পদক্ষেপ গ্রহন না করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসর উভয়ই যে এই জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যূত হযে পড়ার প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখছে তা স্পষ্ট হয়। কিন্তু শ্লেষপূর্ন হচ্ছে, এহেন ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নিজেদেরকে নিরপেক্ষ, অরাজনৈতিক ক্যাটাগরি, বাস্তুচ্যূত প্রক্রিয়ার বাইরের হিসেবে এমন ভাবে পরিবেশন করে যে, কেবল বাস্তুচূত হয়ে পড়া ব্যক্তিবর্গই নয় যেমনটি মালকী দেখিয়েছেন, বরং বাস্তুচূত হয়ে পড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এমন মানুষজনও তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য প্রথমে জাতীয় ও চূড়ান্ত ভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিটির উপর নির্ভর করে। চাকুলীবাসীও তাদের বাস্তুচ্যূত প্রতিহত করার প্রচেষ্টা হিসেবে সরকারের বিভিন্ন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যেমন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রন্ত্রী, প্রধান উপদেষ্টা প্রমুখের কাছে আবেদন করেন, আবেদন করেন ভারত, আমেরিকা সহ বিভিন্ন হাই কমিশনারের কাছে (বিস্তারিত, সুলতানা, ২০০৮)। হিন্দু জনগোষ্ঠী, সামরিক বাহিনী, সরকার, আন্তর্জাতিক পরিসর এই সকল এক্টর গুলোকে একসাথে দাড় করালে ও এদের ভূমিকা, উপস্থিতি, পরিবেশন গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যূতি প্রক্রিয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরের রাজনৈতিক মিথক্রিয়া স্পষ্ট হয়। এখানে উল্লেখ্য পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন মানুষজন কখনোই নিক্রিয় নয়। তাই চাকুলিবাসীও সংগঠিত প্রতিরোধ, প্রাত্যহিক প্রতিরোধ ইত্যাদি নানা ভাবে বাস্তুচ্যূতি প্রক্রিয়ার মোকাবেলা করে যাচ্ছেন (বিস্তারিত, সুলতানা, ২০০৮)।

৫. উপসংহার

এই প্রবন্ধে বাস্তুচ্যূতি প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক দিক উন্মোচনের মাধ্যমে এর গুরুত্বকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষ সামাজিক মর্যাদা, জীবিকা, নিরাপত্তা ইত্যাদি নানা কারনে নিজ বাসভূমিতেই, পরিচিত পরিবেশেই বসবাস করতে চায়। তাই এটা সহজেই অনুমেয় কোন একটা অনুঘটক তা প্রকৃতি বা মানুষের তৈরী যাই হোক না কেন, সামনে আসলেই মানুষজন বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যায় না। তার মানে কোন সিষ্টেমেটিক প্রক্রিয়া আছে, কোন ক্ষমতা আছে মানুষকে মূল উৎপাটিত করে দেবার। সেই প্রক্রিয়াকে কেবল কারণের বিরাট তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করলে সারা পৃথিবীতে মানুষজনের বাস্তুচ্যূত হয়ে পরার গভীরতা কে

বোঝা যাবে না। আর বাস্তুচ্যুতি প্রক্রিয়াকে বুঝতে হলে একে রাজনৈতিক ক্যাটাগরির বাইরে ভাবার সুযোগ নেই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে আমার স্নাতকোত্তর অভিসন্দর্ভের ভিত্তিতে। তাই ডঃ আইনুন নাহারের কৃতজ্ঞতা পাওনা কেননা তার তত্ত্বধায়নেই সম্পূর্ন করা হয়েছিল অভিসর্ন্দভটি। অজ্ঞাতনামা পর্যালোচকের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, তার নির্দেশনা/ সমালোচনা প্রবন্ধটিকে আরো বিশ্লেষণী ও তথ্যপূর্ণ হতে সাহায্য করেছে।

টীকা

[১] অপারেশন ক্লিনহার্ট হচ্ছে সন্ত্রাস দমন সংক্রান্স্থ সেনাবাহিনীর একটি কার্যক্রমের নাম। যে কার্যক্রমের আওতায় সন্ত্রাস দমন করতে চাওয়া হয়েছিল ২০০৩ সালে। সেই সময় যে কাউকে সন্দেহ ভাজন জনিত কারনে গ্রেফতার করার ক্ষমতা সেনাবহিনীকে দেয়া হয়েছিল। যার ফলে সেই সময় সাধারন মানুষজনও বেশ আতংকগ্রস্স্থ হয়েছিল।

[২] দেখুন, দৈনিক প্রথম আলো, ২২শে জুন, ২০০৭।

তথ্যপুঞ্জী

অহমেদ, হাসিনা ১৯৯৩, "নদী ভাঙ্গন জনিত সংকট: মাঠ পর্যায়ের কিছু অভিজ্ঞতা"বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

গুহু, ঠাকুরতা ও বেগম, সুরাইয়া ২০০৫, *বাংলাদেশে অভ্যন্স্থরীন বাস্তুচ্যুত বক্তিবর্গ*, ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

চাকমা, কবিতা ২০০৫, *পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী সেটেলমেন্টের ফলে মারমাদের মধ্যে লিঙ্গীয় ভিন্নতার পুনর্গঠন*, ঢাকা: ফোরাম অন ওম্যান ইন সিকিউরিটি এন্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ারস্ (এফ ও ডাবিস্নউ এস আই এ)।

ভূইয়া, এনামূল হক "শিকস্স্থি পয়স্স্থি আইনের সংস্কার অপরিহার্য", দৈনিক প্রথম আলো ২৬-০৮-২০০৭ ইং।

দেবী মাহাশ্বেতা (বাং, *অরণ্যের অধিকার*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

সুলতানা, নাহার ১৯৯৪, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ঢাকা: ইডেন প্রেস।

সুলতানা, আফরোজা ২০০৮, "আমাগো উঠাইয়া দিয়া হেগো লিগা পাঁচ-দশ তালা দালান উঠাইছে,এইটা ক্যামুন দ্যাশ": বাস্তুচ্যুতি প্রক্রিয়ায় চাকুলীবাসীর টিকে থাকার বহুমাত্রিক কৌশল, অপ্রকাশিত স্নাতকোত্তর অভিসন্দর্ভ, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সুলতানা, আফরোজা ২০০৮, "প্রতিরোধের বহুমাত্রিক গড়ন: একটি নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ", বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

হক, ফাহমিদুল ও রিফাত ফাতিমা ২০০৩, " আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধঃ সন্ত্রাস দমন অথবা তেল উত্তোলন" সেলিম রেজা নিউটন (সম্পাদিত), *মানুষ*, মানুষ আর প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা, সন্ত্রাস-মিডিয়া- যুদ্ধ সংখ্যা, ঢাকা,সমাবেশ ।

হালদার, রুমেল ২০০০, "নদী ভাঙ্গন : পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ও টিকে থাকার প্রক্রিয়া", প্রশান্ত্ম ত্রিপুরা সম্পাদিত, *নৃবিজ্ঞান প্রত্রিকা*, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

হালদার, রুমেল ও গিয়াসউদ্দিন বুলবুল ২০০১, "শ্রেণী ভেদে অভিবাসনঃ প্রেক্ষিত নদী ভাঙ্গনঃ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ও টিকে থাকার প্রক্রিয়া", প্রশান্ত্ম ত্রিপুরা সম্পাদিত, *নৃবিজ্ঞান প্রত্রিকা*, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

Abrar, Chowdhury R and S Nurullah Azad 2003. *Coping with Displacement: River Bank Erosion in North- West Bangladesh,* Dhaka: Refugee and Migratory Movements Research Unit.

Akram, Shahzada M 2003. "Disaster Induced Displacement: The Magurchara Explosion Case", in Chowdhury R. Abrar & Mahendra P. Lama (eds.) *Displaced Within Homelands: The IDPs of Bangladesh and the Region,* Dhaka: Refugee and Migratory Movements Research Unit.

Arsenault, Adrienne 2009. "Inside Swat, Pakistan's Violent valley" in http://www.world/story/2009/04/06/f-rfa-assenault.html.

Birkeland, Nina M 2003. "Last time I fled because of war,this time because of hunger", Environmental change and Internal Displacement in the Huambo province, Angola. in Shanmugaratnam, N, Lund, Ragnhildand Kristi Anne Stolen (eds.) *In the Maze of Displacement: Conflict, Migration and Change,* Norway: Norwegian Academic Press

Brun, Cathrine 2003. "Not Only About Survival: Livelihood Strategies in Protracted Displacement in Shanmugaratnam, Ragnhild Lund & Kristy Anne Stolen (eds.) *In the Maze of Displacement: Conflict, Migration and Change,* Norwegian: Norwegian Academic press.

Choudhury, Arundhuti Roy 2000. "Amusement Parks versus People's Livelihood" in Economic and political weekly, vol 35, No.37

Haque, M Shahidul and Shyla Vohra 2003. "Internal Displacement: The Mandate and Activities of the International Organization for Migration, in Chowdhury R. Abrar & Mahendra P. Lama (eds.) *Displaced Within Homelands : The IDPs of Bangladesh and the Region,* Dhaka: Refugee and Migratory Movements Research Unit.

Hasan, Abu Ala Mahmudul 2005. Demolition of Residences and Eviction of Villagers by Army for DOHS, Unpublished Report, PIL & Advocacy Cell, BLAST.

Hasbullah, S H 2003. "Resettlement of IDPs and Refugees: Lessons Learned in Sri-lanka", in Chowdhury R. Abrar & Mahendra P. Lama (eds.) *Displaced Within Homelands: The IDPs of Bangladesh and the Region,* Dhaka: Refugee and Migratory Movements Research Unit.

Haug, Ruth 2003. What's in a Name: Environmental Refugees in Sudan, in Shanmugaratnam, N, Lund, Ragnhildand Kristi Anne Stolen (eds.) *In the Maze of Displacement: Conflict, Migration and Change,* Norway: Norwegian Academic Press.

Hume, Ina 2003. "The Status of IDPs in the Chittagong Hill Tracts" in Chowdhury R. Abrar & Mahendra P. Lama (eds.) *Displaced Within Homelands : The IDPs of Bangladesh and the Region,* Dhaka: Refugee and Migratory Movements Research Unit.

Human security in Sudan: the report of a Canadin assessment mission prepared for the minister of foreign affairs, Ottawa, January:2000, review of African political economy, vol-27, No-83(March,2000), Taylor & Francis, Ltd.

Lewa, Chris 2003. "Military, Forced Relocation and the IDPs in Burma" in Chowdhury R. Abrar & Mahendra P. Lama (eds.) *Displaced Within Homelands: The IDPs of Bangladesh and the Region,* Dhaka: Refugee and Migratory Movements Research Unit.

Ludlum-Tylor, Louise 1998. "Recent literature on IDPs", in Humpton, Janie(ed.) *Internally displaced people: A global survey,* Norwegian Refugee Council, Global IDP survey & Earthscan publications Ltd.

Lund, Ragnhild 2003. "Representations of Forced Migrations in Conflicting Spaces: Displacement of the Veddas in Sri-lanka", in Shanmugaratnam, Ragnhild Lund & Kristy Anne Stolen (eds.) *In the Maze of Displacement: Conflict, Migration and Change,* Norwegian: Norwegian Academic press

NRC/Global IDP project 2002. *Internally displaced persons,* London: Earthscan.

Malkki, Lisa 1992. "citizens of humanity: internationalism and the imagined community of nations" in Diaspora, Vol-3, No-1.

OCHA 1999. *Hand book for aoolying the guiding principles on Internal displacement.* Goneva/Washington DC: OCHA/The brookings Institutions.

Rashid, K B Sajjadur 2003. "Climate Change and Sea Level Rise : Implications For Population Displacement From the Costal Region of Bangladesh, in Chowdhury R. Abrar & Mahendra P. Lama (eds.) *Displaced Within Homelands : The IDPs of Bangladesh and the Region,* Dhaka: Refugee and Migratory Movements Research Unit.

Saadi, Shashanka 2003. "1998 Flood Induced Displacement: A Case Study of Jamalpur" in Chowdhury R. Abrar & Mahendra P. Lama (eds.) *Displaced Within Homelands: The IDPs of Bangladesh and the Region,* Dhaka: Refugee and Migratory Movements Research Unit.

Stewart, Emma 2003. "internally displaced people a global survey by global IDP project; Norwegian refugee council", the geographical Journal, Vol-169, No-4., Blackwell publication

Zackariya, F & Shanmugaratnam 2003. "Moving into the Extra Household Domain: Survival Struggles of Displaced Muslim in Sri-lanka" in Shanmugaratnam, Ragnhild Lund & Kristy Anne Stolen (eds.) *In the Maze of Displacement: Conflict, Migration and Change,* Norwegian: Norwegian Academic press.

দৈনিক প্রথম আলো ২২/০৬/২০০৭, দৈনিক প্রথম আলো ০৬/০৬/২০০৭
দৈনিক প্রথম আলো ১৪/০৬/২০০৭, দৈনিক জনকণ্ঠ ১৩/০২/২০০৫
দি ডেইলী স্টার ০৬/০৬/২০০৭

ওয়েবসাইট

http://www.dawn.com/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan